গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮-১৪ জুন ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

রাজস্থানের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য বিজেপিই দায়ী

— নীহার মুখার্জী

তফসিলি উপজাতি তালিকায় নিজেদের অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত গুজ্জর সম্প্রদায়ের জনগণের উপর বিজেপি পরিচালিত রাজস্থান সরকার যে ফ্যাসিবাদী কায়দায় গুলি চালিয়ে ১৩ জনকে ঘটনাস্থলেই হত্যা ও শতাধিক ব্যক্তিকে গুরুতরভাবে জখম করেছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩০ মে এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন — তফসিলভুক্ত উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতির ভিত্তিতে সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়ার দাবিতে ছ'বছর প্রচারাভিযান চালিয়েও সরকারের দিক থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট সাড়া না পেয়েই এঁরা আন্দোলনের পথ নিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার আলোচনা-বৈঠকের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করার জন্য কোনও উদ্যোগ না নিয়ে আন্দোলনকারীদের রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করার পথ নিয়েছে। এই সরকারকে খুনি আসামী হিসাবে কমরেড নীহার মুখার্জী চিহ্নিত করেন।

কমরেড মুখার্জী বলেন — সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আজ চাকরির সুযোগ ক্রমাগত যত কমছে, ততই শাসক বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ও তাদের ঐক্যকে ধ্বংস করতে নিকৃষ্ট জাতিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিচ্ছে, সংরক্ষণ ও সংরক্ষণবিরোধী মানসিকতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে, 'কোটা' প্রথাকে কেন্দ্র করে এক গোষ্ঠীর জনগণকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিচ্ছে এবং ভ্রাতৃঘাতী রক্তস্রোতে ডোবাচ্ছে। এইভাবে তীব্র বেকারত্বের আসল কারণটিকে জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর রক্ষাকর্তা সমস্ত দল, বিজেপি, কংগ্রেস, এমনকী মেকি বামপন্থী দলগুলিও জনগণকে এই ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতার ঘেরাটোপে আটকে ফেলতে চাইছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল নির্বাচনে ফয়দা তোলা।

এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ঝোঁক ও উন্মাদনা, যা সমস্যার সমাধান করতে তো পারেই না, বরং মানুষকে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত করে, তার শিকারে পরিণত না হয়ে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সচেতন, সংগঠিত বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কমরেড মুখার্জী বলেন — একমাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বর্তমান সামগ্রিক শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া, জনগণের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা এবং পুঁজিবাদের নিগড় ভেঙে মুক্তি অর্জন ত্বরান্বিত হতে পারে।

শাসকদের চোখে গণআন্দোলনই হচ্ছে 'অশান্তি'

নন্দীগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীণ নেতা শ্রী অশোক ঘোষকে সামনে রেখে শাসক সিপিএম-ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ২৪ মে যে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল তা যে বাস্তবে একটি প্রতারণা, সেকথা ২ জুন বামফ্রন্টের বৈঠকের পর আবার স্পষ্ট হয়ে গেল। ২৪মে'র বৈঠক ভেঙে যাওয়ার পর 'বৈঠকের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে', 'সকল দলের সঙ্গে আবার কথা বলা হবে', 'হোমওয়ার্ক করে নেওয়া হবে', 'শান্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত হতে দেওয়া হবে না' ইত্যাদি যেসব বিবৃতি সিপিএমের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে তাও সেই একই প্রতারণারই অঙ্গ।

জনসাধারণের অবশ্যই মনে আছে, ২৪ মে'র সর্বদলীয় বৈঠকে এস ইউ সি আই যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। সর্বদলীয় বৈঠকের প্রস্তাব দিয়ে ১০ মে শ্রী অশোক ঘোষ প্রথম যখন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদককে ফোন করেন, তখনই আমরা কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দাবি রেখেছিলাম, যেগুলির মীমাংসা না হলে সর্বদলীয় বৈঠক ফলপ্রসূ হতে পারে না বলে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত ছিল। আমরা বলেছিলাম, এ ধরনের কোনও আলোচনায় সর্বপ্রথম নন্দীগ্রামের জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে ডাকতে হবে ; যে সব পুলিশ অফিসারদের নির্দেশে ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের নিরস্ত্র মানুষের ওপর বর্বর পুলিশি আক্রমণ চালানো হয়েছিল, তাদের শাস্তি দিতে হবে ; পুলিশের সঙ্গে সিপিএমের যে ক্রিমিনাল বাহিনী ঢুকেছিল এবং নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছিল, তাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ; নিহতদের পরিবার ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে ; আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

এক কথায় গণহত্যাকারী ও গণধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা না করে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা কার্যত নন্দীগ্রামের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যেটা এস ইউ সি আই করতে পারে না। ২২ মে সরকারিভাবে সর্বদলীয় বৈঠকের চিঠি পাওয়ার পরও এস ইউ সি আই এই দাবিগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছিল এবং সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল।

তৃণমূল ও কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগ দেয়। বিজেপি-কে বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে তারা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। বৈঠকে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী গণহত্যা শব্দটি প্রস্তাবে যুক্ত করার দাবি তোলেন। সিপিএম তা অস্বীকার করে, বৈঠক ভেঙে যায়। অথচ এ কথা জানাই ছিল যে, সিপিএম ১৪ মার্চের নন্দীগ্রামের হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা বলতে রাজি নয় এবং সেকথা তারা আগেই ঘোষণা করে

দুয়ের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ সংগ্রামের বীর শহীদদের স্মরণে বিরাট সমাবেশ

৩০ মে দলের মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে নন্দীগ্রামে এক বিশাল জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ এই সমাবেশে সমবেত হয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি তাঁদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাতে, নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিতে। গ্রামের সাধারণ মানুষ এত মনোযোগ দিয়ে যে রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। সত্যিকারের গণআন্দোলনের প্রভাব ছাড়া এ কখনই সম্ভব হত না!

৩০ মে সমাবেশের স্থান ছিল নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ড। নন্দীগ্রামের সমাবেশে যোগ দিতে মানুষ এসেছিলেন নন্দীগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে — পায়ে হেঁটে, ট্রেকারে চড়ে। জেলার অন্যান্য প্রান্ত থেকেও কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষ এসেছিলেন গভীর আবেগ নিয়ে সংগ্রামী নন্দীগ্রামের মাটি স্পর্শ করতে। সোনাচূড়া, ভাঙাবেড়া, কালীচরণপুর প্রভৃতি আক্রান্ত গ্রামগুলি থেকে এসেছিলেন শতশত নারী-পুরুষ, যাঁদের অনেকেই ১৪ মার্চ পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হয়েছেন। সোনাচূড়ার চাঁদারপুল গ্রাম থেকে এসেছিলেন অশোক মণ্ডল। ১৪ মার্চ গুরুতর আহত হয়েছিলেন তিনি। বললেন, "পাঁচ মাস ধরে প্রতিরোধ চালাচ্ছি, প্রয়োজনে আরও পাঁচ বছর চালাব, তবু কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি আমরা দেব না।" এসেছিলেন প্রৌঢ় কৃষক অশোক প্রধান। সর্বদলীয় বৈঠক নিয়ে তাঁদের কী বক্তব্য জানতে চাইলে দৃঢ়তার সাথে তিনি উত্তর দিলেন, "শান্তি আমরা চাই। কিন্তু শান্তি সর্বদলীয় বৈঠকে আসবে না; আসতে পারে একমাত্র অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার মধ্য দিয়ে।" অশোকবাবু কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী নন। একজন সাধারণ চাষী। কথা বলে দেখা গেল, এই মনোভাব প্রায় নন্দীগ্রামের সকল মানুষেরই। তাঁদের এই মনোভাবই অনুপ্রাণিত করেছে অন্যান্য এলাকা থেকে আসা মানুষদের। নন্দীগ্রাম তাঁদের শিখিয়েছে অনেক কিছু। নন্দীগ্রাম পড়ে পড়ে মার খেতে থাকা মানুষকে ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে, নন্দীগ্রাম শিখিয়েছে অধিকার রক্ষার জন্য কীরকম মরণপণ করে লড়তে হয়। এস ইউ সি আইয়ের বিপ্লবী রাজনীতি শিখিয়েছে, লড়াইয়ের ময়দানে ধর্ষিতা, অত্যাচারিতা সংগ্রামী নারীকে কীভাবে সম্মান জানাতে, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হয়। তাই প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ যখন বলেন, যে মা-বোনেরা ধর্ষিতা হয়েছেন তাঁদের মাথা নিচু করে চলার কোনও কারণ নেই। আজ যদি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁরা এঁদের কোলে টেনে নিতেন। যাঁরা এঁদের সম্মানের আসনে বসাতে পারবেন না, তাঁরা এই মনীষীদের নাম উচ্চারণ করার যোগ্য নন; তখন উপস্থিত সমগ্র জনতা সহর্ষ অনুমোদনে তাঁদের অভিনন্দিত করেন। কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্যেরই অনুরণন বয়ে যায় গোটা সভায়— এঁরা আমাদের মা, আমাদেরই বোন, এঁরা জমি রক্ষার লড়াইয়ের বীর সেনানী, এঁদের আমরা মাথায় করে রাখবো।

প্রায় বিশ হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন

চারের পাতায় দেখুন

৩০ মে নন্দীগ্রামের বীর শহীদদের স্মরণে বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

শহরে জমির ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে — প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, "রাজ্য সরকার আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কলকাতা শহরের জমির মালিকানা কার্যত একচেটিয়া পুঁজিপতি, বড় বড় ব্যবসায়ী ও মাল্টিন্যাশানালদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। এর ফলে এরা অবাধে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা চালাবে এবং সেজন্য কলকাতা শহর থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব বস্তিবাসীদের উৎখাত করা হবে।

"আমরা এই জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানাচ্ছি এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নাগরিকদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।"

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ২৭ মে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী এ' বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেদিনীপুর জেলার ছাত্রী মৌপিকা কোটাল। ৪০০ নম্বরে তার প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৩। ৫৩২ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এর মধ্যে রাজ্যস্তরে বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৫২ জন। তাদের এক বছরের জন্য ১২০০ টাকা প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে জেলা বৃত্তিপ্রাপক ৪৮০ জন ছাত্রছাত্রীকে এক বছরের জন্য ৬০০ টাকা প্রদান করা হয়। বৃত্তির মোট অর্থমূল্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এই সঙ্গে বিশেষ শংসাপত্র এদের হাতে তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়।

এবার পরীক্ষায় পাশের হার ৬৮.৮৫ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৪.৭৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগে ২৫.৩২ শতাংশ এবং সাধারণভাবে ১৮.৭৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

বিষয়ভিত্তিক পাশের হার — ইংরেজি ৯০.০৭ শতাংশ, বিজ্ঞান ৮৬.৩৩ শতাংশ, ইতিহাস-ভূগোল ৭৮.৬৫ শতাংশ, মাতৃভাষা ৭৮.০২ শতাংশ, গণিত ৭৬.৭৬ শতাংশ।

পর্ষদ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা বলেন, এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে রাজ্য সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতি মানুষ গ্রহণ করেনি। তিনি অবিলম্বে সরকারের কাছে প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা ও বৃত্তি পরীক্ষা চালুর দাবি জানান।

পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে বলেন, শিক্ষার মানের উন্নয়নকল্পে এই পরীক্ষা এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একে আরও ব্যাপক করতে হবে। সরকার দাবি না মানলে আমাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে। অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন, গ্রাম-গঞ্জে, শহরে সর্বত্র এই পরীক্ষা যেভাবে সাড়া জাগিয়েছে সরকারের উচিত অবিলম্বে সমস্ত দাবি মেনে শিক্ষায় সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় এই পরীক্ষার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে একে আরও প্রসারিত করার জন্য সকলের কাছে আবেদন রাখেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সাহিত্য সমালোচক মানিক মুখার্জী বলেন, কোনও সরকার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে অবিলম্বে জনস্বার্থে শিক্ষার এই দাবি মেনে নেওয়া উচিত।

শিলিগুড়িতে আইন অমান্য

নন্দীগ্রামে গণহত্যাকারী ও ধর্ষণকারী সিপিএম দুষ্কৃতীবাহিনী ও পুলিশের কঠোর শাস্তি, শিল্পের নামে উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ ও এস ই জেড-এর নামে শোষণনীতি বাতিল, অবিলম্বে বন্ধ চা-বাগান সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও চালু করা, সিঙ্কোনা বাগিচার পুনরুজ্জীবন এবং অকৃষি জমিতে কর্মসংস্থানমুখী শিল্পস্থাপনের দাবিতে ২৮ মে এস ইউ সি আই দার্জিলিং জেলা কমিটির আহ্বানে শিলিগুড়ির কোর্টে আইন অমান্য আন্দোলন সংঘটিত হয়।

এয়ারভিউ মোড় থেকে জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দুই শতাধিক মানুষের এক সুসজ্জিত মিছিল শিলিগুড়ি শহর পরিক্রমা করে কোর্ট চত্বরে উপস্থিত হলে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং একজন মহিলা কর্মী আহত হন। জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য নন্দীগ্রামের খুনিদের জঘন্য অপরাধকে আড়াল করার সরকারি অপচেষ্টাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর করার ডাক দেন।

নন্দীগ্রামে গণহত্যা ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রতিবাদে

জয়নগরে মহিলাদের মহামিছিল

২০ মে জয়নগরের মানুষের গর্বের দিন। জয়নগরের হাজার হাজার মানুষ সেদিন প্রত্যক্ষ করল এক অবিস্মরণীয় মিছিল। জয়নগর বিধানসভার দক্ষিণ বারাসতের মগরাহাট মোড় থেকে হাজার হাজার মা-বোন দীর্ঘ আট কিমি পথ পরিক্রমা করে মুলদিয়া মোড় পর্যন্ত মহামিছিল সংগঠিত করলেন। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে জয়নগরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মা-বোনেদের সমাবেশ দেখে কেউ বলেছেন, ১০ হাজার, কেউ বলেছেন তারও বেশি। মহিলা মিছিলের সূচনায় বিশাল সভায় বক্তব্য রেখেছেন এস ইউ সি আই-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। তিনি বলেন, ''জয়নগর বহু ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাক্ষী। এখানে মা-বোনেরাও বহু ইতিহাস রচনা করেছেন। নন্দীগ্রামে সিপিএম-এর বর্বরতার প্রতিবাদে আজকের এই মহামিছিল একটা নতুন ইতিহাস তৈরি করছে।'' মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ সুজাতা ব্যানার্জী, সবিতা দাস, মাধবী প্রামাণিক, সফি পৈলান, মিনা নস্কর, কবিতা সরদার প্রমুখ। সুসজ্জিত একাধিক ট্যাবলো, অসংখ্য দাবি ফেস্টুন সহ সুশৃঙ্খল মহামিছিল স্লোগানে মুখরিত হয়ে এগোতে থাকে জয়নগর-মজিলপুর শহরের দিকে। মিছিল থেকে হাজার হাজার কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে 'নন্দীগ্রামে গণহত্যাকারীদের বিচার চাই', 'নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনকারীদের বিচার চাই', 'শিশুহত্যার বিচার চাই', 'কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা চলবে না', 'কর্মসংস্থানমুখী শিল্প স্থাপন করতে হবে।' মিছিল দুর্গাপুরে পৌঁছানোর পর বৃষ্টি শুরু হলেও তা মিছিলের দৃপ্ততা বা বলিষ্ঠতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। পথে নানা মোড়ে হাজার হাজার মানুষ মিছিলকে অভিনন্দিত করেন। সন্ধ্যা ৭টায় মুলদিয়া মোড়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানেও শত শত মানুষ মিছিলকে অভিনন্দন জানান এবং হাজার হাজার মহিলা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের শপথ নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কাকদ্বীপে পরিবহন যাত্রী কমিটি গঠিত

দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা-কাকদ্বীপ ৯৪ নং বাসরুটে বাসমালিকরা ১০ জানুয়ারি থেকে সম্পূর্ণ বিনা কারণে বাসভাড়া বাড়িয়ে দেয়। এই ভাড়াবৃদ্ধির ফলে এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং কৃষিজীবী মানুষেরা খুবই সমস্যার সম্মুখীন হন। এর প্রতিবাদে গত ১৫ মে নারায়ণপুরের নিউ এজ ক্লাবে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার ১০টি ক্লাব, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি, মৎস্যজীবী ও মৎস্য কর্মচারী সমিতির সদস্য সহ শতাধিক মানুষ এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন গণেশনগর হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হৃষিকেশ পাত্র। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন পরিবহন যাত্রী কমিটির সহসভাপতি প্রবীর দাস, নিউ এজ ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক আশীষ কমল গায়েন, সভাপতি ঝন্টু বর্মন, ইয়ুথ ফোরাম ক্লাবের সম্পাদক মদন কয়াল, নারায়ণবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অমলকুমার মাইতি, পরিবহন যাত্রী কমিটির সদস্যা প্রতিভা মিশ্র, অমিয় শাসমল প্রমুখ। পরিবহন যাত্রী কমিটির রাজ্য সম্পাদক সদানন্দ বাগল তাঁর ভাষণে বলেন, সরকার যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পরিবর্তে তেলের দাম কমা সত্ত্বেও বারবার ভাড়া বাড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি এর বিরুদ্ধে আর টি এ'র নিকট ডেপুটেশন সহ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান।

হৃষিকেশ পাত্রকে সভাপতি, অমল কৃষ্ণ মাইতি ও স্বদেশ বেরাকে যুগ্ম সম্পাদক এবং চিত্তরঞ্জন জানাকে কোষাধ্যক্ষ করে ৬০ জনের কাকদ্বীপ পরিবহন যাত্রী কমিটি গঠিত হয়।

শাসকদের চোখে গণআন্দোলনই হচ্ছে অশান্তি

একের পাতার পর

দিয়েছিল। বাস্তবে কোনও সরকারই গণহত্যা করার পর তা স্বীকার করে না। একমাত্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই কোনও সরকারকে তা স্বীকার করতে বাধ্য করা যায়। আসলে, এস ইউ সি আই সর্বদলীয় বৈঠকের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে যে সুনির্দিষ্ট দাবিগুলি তুলেছিল, সেটা জনগণের দাবিতে পরিণত হয়, বিশেষ করে নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষ ঐ দাবিগুলির মধ্যে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন দেখতে পায়। এই অবস্থায় তৃণমূল জনগণের অত্যন্ত ন্যায্য এই দাবিগুলি না তুলে বৈঠকে যোগ দেওয়ায় তাদের দলের মধ্যে এবং নন্দীগ্রামের জনগণের মধ্যে প্রবল সমালোচনার ঝড় ওঠে, যার সামনে পড়ে কোনও একটা ইস্যু তুলে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব।

এখন, এস ইউ সি আই যে দাবিগুলি তুলেছিল, দেখা গেল সর্বদলীয় বৈঠক ভেঙে যাওয়ার পর তৃণমূল এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও সেইসব দাবিগুলি বারেবারেই বলা হচ্ছে। বৈঠকের আগে এই দাবিগুলি শর্ত হিসাবে রাখলে শান্তির নামে নিজেদের অপরাধকে আড়াল করার সিপিএমের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার মুখোশ খুলে দেওয়া অনেক সহজ হতো। সময়মতো এই ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজনীয় পথটি উভয় দলই সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে।

সিপিএম নেতারা এখন অভিধান খুলে, রাষ্ট্রসংঘের সনদ বের করে কাকে গণহত্যা বলে, কতজন মারা গেলে গণহত্যা হয়, ইত্যাদি আবিষ্কার করছেন ও প্রচার করছেন। সিপিএম নেতারা যাই বলুন, সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণ দৃঢ়ভাবে মনে করে, নন্দীগ্রামে যা হয়েছে, তা গণহত্যাই।

জনগণের আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সিপিএমের মুখে শান্তির বাণী আর যাই হোক, নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত জনগণের মনে কোনও আস্থা সৃষ্টি করতে পারে না। নন্দীগ্রামের ভিতরকার পরিস্থিতি, সামাজিক জীবন, প্রশাসনিক কাজকর্ম, আইনশৃঙ্খলা, স্কুল-কলেজ সবই স্বাভাবিকভাবে চলছে। মানুষের মধ্যে আতঙ্কের কারণ হিসাবে বিরাজ করছে খেজুরি থেকে প্রতিদিনের আক্রমণ যেটা সিপিএম চাইলেই বন্ধ করতে পারে। ফলে ৩ জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত নন্দীগ্রামে শান্তিভঙ্গ করে যাচ্ছে সিপিএম ও তার সরকার। শান্তি তাদের হওয়া প্রয়োজন। তা না হয়ে সেই সিপিএমের মুখে শান্তির বুলির মতলব যে ভিন্ন তা বুঝতে অসুবিধা কোথায়? আসলে, নন্দীগ্রামের মানুষ যেভাবে সেজ গঠনের সরকারি পরিকল্পনা রুখে দিয়েছে, একটা স্বৈরাচারী সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করেছে, তা সারা ভারতবর্ষের শেষিত জনগণের কাছে একটা মহৎ দৃষ্টান্ত। একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে সংগঠিত নেতৃত্বে আন্দোলন চালালে তার রূপ কী হতে পারে, নন্দীগ্রাম সেটা তুলে ধরেছে। পাঁচ মাস হতে চলল নন্দীগ্রামের মানুষ পুলিশকে এলাকায় ঢুকতে দিচ্ছে না, পুলিশের ওপর তাদের কোনও আস্থা নেই। কারণ তারা দেখেছে, পুলিশকে সামনে ও পাশে নিয়ে সিপিএম ক্রিমিনালবাহিনী কীভাবে তাদের জীবনকে ছারখার করে দিতে পারে। পুলিশ ঢুকতে পারছে না, অথচ সেখানে আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন হয়নি, জনগণই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করছে, নাগরিক জীবন স্বাভাবিক ভাবে চলছে, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে, রেজাল্টও ভাল করছে, এটা শাসক দল ও শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে করেই হোক, জনগণের এই প্রতিরোধ ভাঙতে তারা তৎপর হয়ে উঠেছে। জনগণের এই আন্দোলনই হচ্ছে শাসকদের কাছে 'অশান্তি'। শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখনই শাসকরা বলবে যখন জনগণের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে তারা ধ্বংস করতে পারবে। নন্দীগ্রামের জনগণ এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। আর ঠিক সে কারণেই সিপিএম দল ও তার সরকারের মন্ত্রীদের শান্তির মুখোশের আড়ালে আসল চেহারাটা ধরা পড়ে গেছে।

‘ঘেরাও’-এর জন্য কারখানা বন্ধ হয়নি

নিজেদের দলটিকে শ্রমিকশ্রেণীর দল হিসাবেই জাহির করে সিপিএম। অথচ এ’দলের নেতা-মন্ত্রীরা পুঁজির ভজনায় মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন।

সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বয়ং দু’বেলা নিজেকে ‘ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি’ অর্থাৎ ‘পুঁজিবন্ধু’ বলে বর্ণনা করতে করতে কার্যত পুঁজিপতিদের ভজনায় প্রাণ নিবেদন করেছেন। বন্ধ কারখানার অনাহারী শ্রমিক কিংবা ছাঁটাই হওয়া মজুরের পাশে তাঁকে ইদানীং দেখা যায় না, তার বদলে প্রায় প্রতিদিনই তিনি শিল্পপতিদের সভায় মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করেন। এ’রাজ্যে শিল্প গড়ে না ওঠার বা কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্ত দায়িত্ব শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রতিনিয়তই শ্রমিকদের উদ্দেশে তিনি হুংকার ছাড়েন — ‘এ’রাজ্যে শ্রমিক অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না’, ‘পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে’, ‘শিল্পপতিদের কাছে কোনভাবেই কোনও ভুল বার্তা যেন না পৌঁছায়, তাই শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সংযত ও দায়িত্বশীল হতে হবে’, ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্প্রতি যাটের দশকের শ্রমিকের দাবি আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ‘ঘেরাও’ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ঐ ধরনের আন্দোলন করা তাঁদের ভুল হয়েছিল।

বুদ্ধদেববাবুদের এহেন অমৃতবাণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে পুঁজিমালিকদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যমগুলিও শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনবরত বিষোদ্‌গার করে। প্রচারের ঢাক পিটিয়ে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের কারণেই এতদিন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপতিরা পুঁজি বিনিয়োগ করতে ভয় পেয়েছে এবং শ্রমিক-আন্দোলনের চাপেই নাকি তারা কলকারখানায় তালা ঝুলিয়ে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। এঁদের ভাবখানা এমন, যেন শ্রমিক-বিক্ষোভের জেরেই পশ্চিমবঙ্গের ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকারে পরিণত হয়েছে।

এ প্রচার নতুন নয়। এর শুরু যাটের দশকের শেষ দিকে। সেই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গকে ‘বিনিয়োগকারীর দুঃস্বপ্নের নগর’ বলে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই প্রচার চলতে থাকে। শিল্প না হওয়ার যাবতীয় দায়ভার শ্রমিক আন্দোলনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সেই ধারা অনুসরণ করেই আজকের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন — ঘেরাও আন্দোলনে সামিল হওয়া তাঁদের ভুল হয়েছিল।

এ’কথা সত্য যে, যাটের দশকের বিশেষ করে ’৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ছিল শ্রমিক আন্দোলনে উত্তাল। সেই সময়ে ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকারের শরিক ছিল এস ইউ সি আই। শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন এস ইউ সি আই নেতা প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ চলবে না — এস ইউ সি আই-এর চাপে এই শর্ত সেই সরকার মানতে বাধ্য হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে মালিকের শোষণ-জুলুমে জর্জরিত হতে থাকা মেহনতি মানুষের মধ্যে সেইসময় প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। নিজেদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য বঞ্চিত নিপীড়িত শ্রমিকরা সেদিন কলে-কারখানায় পুলিশি হস্তক্ষেপমুক্ত পরিবেশে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সেই আন্দোলনেরই একটি রূপ ছিল, কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে রাখা, যা ‘ঘেরাও’ আন্দোলন নামে বহুখ্যাত হয়েছিল। আশ্চর্যের হলেও এ’কথা সত্য যে, আজ যে সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঘেরাও আন্দোলনের সমালোচনা করছেন, সেই সময় সেই সিপিএম দলটি এই ঘোষণাটির তাৎপর্য ধরতে না পেরে এবং এস ইউ সি আই-এর সতর্কবার্তা বারংবার উপেক্ষা করে বহুক্ষেত্রেই সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করেছিল, যার ফলে পরবর্তীকালে এ রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলন বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কিন্তু কেন সেদিন আন্দোলনে যেতে হয়েছিল শ্রমিকদের? বস্তুত, মালিকী অত্যাচারে জর্জরিত এবং ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত শ্রমিকদের বুকে ক্ষোভের বারুদ দীর্ঘদিন ধরেই জমে ছিল। তার ওপর অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শিল্পগুলিতে মজুরির হার ছিল কম। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের ক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ করেছিল যখন-তখন ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। বাস্তবে ৬০-এর দশকে গোটা ভারতবর্ষের অর্থনীতি ভয়ঙ্কর মন্দার কবলে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ছিল মারাত্মক। অর্ডারের পরিমাণ কমে যাওয়ায় বহু কলকারখানার মালিক উৎপাদন কমিয়ে ফেলে। মুনাফার যাতে ঘাটতি না হয়, তার জন্য চলতে থাকে নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই। বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার বেকার শ্রমিক পথে বসে। এই অবস্থায় যেকোন সময়ে কাজ চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় কর্মরত শ্রমিকদের মানসিক উদ্বেগ ছিল চূড়ান্ত। তার উপর তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী মালিক তোষণের প্রচলিত ধারার ছেদ ঘটিয়ে শ্রমিকের ন্যায্য দাবিদাওয়ার পক্ষে দাঁড়াতে সরকারকে বাধ্য করেন। ফলে ভয়ভীতিহীন পরিবেশে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের পক্ষে এক চূড়ান্ত অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ-যন্ত্রণা বহিঃপ্রকাশের পথ খুঁজে নেয় মালিকের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে। এই বিক্ষোভেরই একটি রূপ হিসাবে বহুক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে দাবি আদায়ের লড়াই চালায় শ্রমিক সংগঠনগুলি। সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল এবং পুঁজিমালিকদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যম গোটা দেশ জুড়ে শ্রমিকআন্দোলনবিরোধী প্রচারের ঢাক পেটাতে থাকে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানাগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে থাকে, শ্রমিকদের জঙ্গিপনার জন্যই কারখানাগুলির এই হাল। কিন্তু বাস্তবে কি সত্যই তাই ঘটেছিল? না, তা ঘটেনি। শ্রমিকআন্দোলন কিংবা ধর্মঘটের চাপে নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলি সেইসময় বন্ধ হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দার কারণে, মালিকের নিজস্ব মুনাফার হিসাব ঠিক রাখতে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে যে ‘ঘেরাও আন্দোলনে’র বিরুদ্ধে এত আওয়াজ তোলা হয়, ৬০-এর দশকে কলকারখানায় তালা ঝোলানোর পিছনে সেই ঘেরাও আন্দোলনের ভূমিকা ছিল নিতান্তই নগণ্য। খোদ সরকারি তথ্যেই এ’কথার প্রমাণ মেলে। নীচে ১৯৭২ সালের ‘লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’ পুস্তকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত একটি তালিকা দেওয়া হল।

বছর	বন্ধ কারখানার সংখ্যা	ঘেরাও -এর সংখ্যা	ঘেরাও-এর কারণে বন্ধ হওয়া কারখানা
১৯৬৭	১২৩	৩১১	২
১৯৬৮	১৪০	৩০	১
১৯৬৯	১৮৩	৫১৭	১
১৯৭০	৩২২	৬০	১

ঐ একই পুস্তকে প্রকাশিত আর একটি তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ধর্মঘটের কারণে যত সংখ্যক শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে, মালিকের লকআউট ঘোষণার কারণে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার অনেকগুণ বেশি। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৭ সালে মোট নষ্ট হওয়া শ্রমদিবসের ৬৯.৫ শতাংশই নষ্ট হয়েছে কারখানা মালিকের ডাকা লকআউটের কারণে। ১৯৬৮তে এই সংখ্যা ছিল ৫৩ শতাংশ এবং ১৯৭৯-এ ৬২.৩ শতাংশ।

এই সমস্ত লকআউটের সঙ্গে কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট, ঘেরাও তথা শ্রমিক বিক্ষোভের বিন্দুমাত্র সংযোগ ছিল না। বাজারের চাহিদা এবং কারখানাগত নানা বিষয় বিবেচনা করে, স্রেফ নিজের মুনাফা বজায় রাখার যে স্বার্থে মালিকরা কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত চিরকাল নিয়ে থাকে, ৬০-এর দশকের কলকারখানা বন্ধের পিছনেও মালিকের সেই স্বার্থবোধই কাজ করেছে। তা সত্ত্বেও শিল্প গড়ে না ওঠার মিথ্যা দায় আজও বহন করে চলেছে এ’রাজ্যের শ্রমিকরা। ‘বাম’ তকমাধারী একটি ফ্রন্ট গত ৩০ বছর ধরে সরকারে আসীন থাকা সত্ত্বেও আজ পশ্চিমবঙ্গের ৫৬ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ৮ ঘণ্টার শ্রমদিবস আজ প্রায় গল্পকথা। অবাধে চলছে কর্মীসংকোচন। কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্য পি এফ এবং ই এস আই-এর কোটি কোটি টাকা লোপাট করে দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকার ও তার প্রশাসন শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে তাই নয়, বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শিল্পে শান্তি রক্ষার নামে অবিরত বঞ্চিত শ্রমিকদের আন্দোলনের পথে না যাওয়ার জন্য শাসানি দিয়ে চলেছে। বাস্তবে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতি তোষামোদির প্রতিযোগিতায় ‘বাম’ নামধারী এই ফ্রন্টটি আজ দক্ষিণপন্থী দলগুলিকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে।

(ব্যবহৃত তথ্যগুলি ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ‘Labour Mood in West Bengal’ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া)

এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র

কলকাতা জেলার অন্যতম শিল্পাঞ্চল হ’ল তারাতলা-গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ। একসময় এখানে লক্ষাধিক শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান ছিল, ছিল বিভিন্ন ছোট-বড়-ভারি কারখানা। আজ সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের মালিকতোষণ-শ্রমিকপেষণ নীতির ফলে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ কলকারখানা বন্ধ, কয়েকটিতে নামমাত্র শ্রমিক কর্মরত। এদের মধ্যে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা নগণ্য, বেশিরভাগই অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রমিক। এই অঞ্চলে অ্যাসবেস্টস শিল্পের অন্যতম বড় কারখানা ভারত বিখ্যাত এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজে এখন মাত্র ২৩০ জন শ্রমিক কাজ করেন। এই কারখানায় বিগত ১০ বছরে কোন বেতন চুক্তি হয়নি। শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত, যদিও এখানে এইচ এম কে পি, আই এন টি ইউ সি এবং সিপিএম পরিচালিত সিটুর ইউনিয়ন আছে এবং সিটুর নেতৃত্বে কারখানার ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত হয়। দীর্ঘ বঞ্চনা, অত্যাচারের পর কারখানার বেশিরভাগ শ্রমিক সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত এভারেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করে এবং তীব্র সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমে ৫৫% ভোট অর্জন করে প্রিন্সিপাল বার্গেনার হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে। এবার লড়াই শুরু হয় দীর্ঘমেয়াদী বেতন চুক্তির জন্য। বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন সংগঠিত করার পর কিছুদিন ধরে চলছিল ধীরে চলো নীতি। এই চাপের মুখে যখন ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের দেওয়া শর্তানুসারে চুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে শ্রমিকদের দ্বারা ঘৃণিত ও বর্জিত সিটু, এবং আই এন টি ইউ সি, এইচ এম কে পি ইত্যাদি ইউনিয়ন, সরকার ও সিপিএমের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে এবং ম্যানেজমেন্টের একাংশের সঙ্গে বসে স্থির করে যে, ‘হিন্দমোটর’ কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য সংগ্রামকে যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, সেই ফর্মুলা এভারেস্টে প্রয়োগ করা হবে, অর্থাৎ লড়াকু শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-এল এস’কে বাদ দিয়ে ম্যানেজমেন্টের একাংশের সহযোগিতায় একটা যেমন তেমন বেতনচুক্তি করা হবে, যার দ্বারা এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যাবে, রাজনৈতিক স্বার্থ এবং প্রতিহিংসা দুই-ই চরিতার্থ হবে। এই প্রেক্ষাপটে, ইউ টি ইউ সি-এল এস পরিচালিত ইউনিয়নটি লাগাতার ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং এই লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে গত ২২ মে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল কারখানার গেট থেকে বের করে। ৭৫ শতাংশ লড়াকু শ্রমিকের অংশগ্রহণে দৃপ্ত সংগ্রামী মিছিল যখন ব্যানার্জী বাগান, ফতেপুর বাজার, দীনু মিস্ত্রি বাজার, তাঁতিপাড়া প্রভৃতি শ্রমিক বসতিপূর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করছিল, তখন পথের দু’ধারে অধিবাসীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ইস্পাতদৃঢ় সংগ্রামী শ্রমিকদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল; বৃদ্ধদের মনে পড়ছিল তাঁদের যৌবন কালের কথা। এই পথপরিক্রমার মাঝে মাঝে অধিবাসীদের অনুরোধে চলমান পথসভা হয়। এই পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড বসন্ত জয়সোয়ারা, কর্মকর্তা কমরেড স্বপন জানা, এস ইউ সি আইয়ের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড উপেন্দ্র ভক্ত। পরিশেষে মিছিল বাঁধাবটতলায় উপস্থিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর জেলা সম্পাদক এবং ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ। তিনি বলেন যে, এ্যাসবেস্টস শিল্পে অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় এভারেস্ট হচ্ছে রাঘব বোয়াল। কোম্পানির লাভের পরিমাণ এত বেশি যে, শেয়ার হোল্ডারদের এই বছরে ৭৬ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিয়েছে, অথচ শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক বেতন ৭.৫০ টাকা। বিগত ১০ বছর ধরে কোন বেতনচুক্তি হয়নি, কিন্তু কাজের বোঝা দিন দিন বেড়েই চলেছে, বেড়ে চলেছে ছাঁটাইয়ের হুমকি, দালালদের সহযোগিতায় সাসপেনশন, চার্জশিট। এর বিরুদ্ধে যখন শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন এইচ কে এম পি, আই এন টি ইউ সি, সিটু এই লড়াই ভাঙবার জন্য মালিকদের সঙ্গে বসে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। তিনি এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে শ্রমিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মধুকুণ্ডায় জনসভা

নন্দীগ্রামের আন্দোলনরত মানুষের সমর্থনে ২৬মে এস ইউ সি আই মুরাডি বালিতোড়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে পুরুলিয়ার মধুকুন্ডায় এক জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা, দলের মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান নন্দীগ্রামের লড়াই, এস ইউ সি আইয়ের সর্বদলীয় বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং সংবাদমাধ্যম ও পুঁজিপতিশ্রেণীর পরিকল্পিতভাবে ‘একের বিরুদ্ধে এক’ স্লোগান তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা সম্পর্কে দলের বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের সামনে তুলে ধরেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুরাডি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড বিনয় ভট্টাচার্য ও সদস্য কমরেড অজিত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কুশধ্বজ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী বচনচন্দ্র দাস।

উৎপাদন বাড়ছে, লাভ হচ্ছে কার ?

বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ-এর বর্তমান জমানায় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেকে দেশের উন্নয়নের সূচক হিসাবে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধির হার বা জিডিপিকে বেছে নিয়েছেন। জিডিপি হল, একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যা কিছু উৎপাদিত হয়েছে, তার যোগফল। এই পথ ধরে আমাদের দেশের মন্ত্রী-আমলা ও সরকারি দলগুলির নেতারাও প্রতি বছর জিডিপি বৃদ্ধির হার কত হল, আগামী বছরের লক্ষ্যমাত্রাই বা কী, — বেশ ঘটা করে বাজেটের আগে-পরে তা প্রকাশ করেন, উন্নয়নের ঢাক পেটান।

বস্তুত, অঙ্কের বিচারে গত কয়েক বছর ধরেই ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশ চড়া হতে দেখা যাচ্ছে। এই নিরিখে বিশ্বে চীনের পরেই ভারতের স্থান। উদারনীতির পথ ধরে ১৯৮৩ থেকে '৯৩ - '৯৪ এই সময়ে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৫.২ শতাংশ। '৯৩-'৯৪ থেকে '৯৯-২০০০-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৭ শতাংশে। বর্তমানে এই হার ৮-৯ শতাংশ। সুতরাং আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারের মাধ্যমে যদি দেশের উন্নয়নের হাল বোঝার চেষ্টা করা হয়, তাহলে বলতেই হয় যে, হ্যাঁ, উন্নয়ন হয়েছে, দেশের সম্পদও বেড়েছে। অথচ, তা সত্ত্বেও দেশের মানুষের জীবনের মান বা তাদের আয় বাড়ছে না। কেন ? তাহলে বাড়তি সম্পদটা যাচ্ছে কার পকেটে ? জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (এন এস এস ও)-র রিপোর্টও বলছে যে, দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির বদলে অবনতিই ঘটেছে। গ্রামীণ ভারতের ৩৩ শতাংশ মানুষ দিন চালানোর জন্য দৈনিক খরচ করতে পারে ১২ টাকারও কম। শহরে ৩০ শতাংশ মানুষকে দিন চালাতে হয় ১৯ টাকায়। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির দিনে এই সামান্য টাকায় কীভাবে তাদের দিন গুজরান হয় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অথচ এই পরিস্থিতি ভেঙে বেরিয়ে আসারও উপায় নেই। কারণ কর্মসংস্থানের ব্যাপক ঘাটতি। ফলে রোজগারের পথ বন্ধ। দেখা যাচ্ছে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার প্রতি বছর উর্ধ্বমুখী হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩-'৯৪-এ উৎপাদন দ্রুত হারে বাড়লেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.৭ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ২০০০-এর মধ্যে তা আরো কমে গিয়ে পৌঁছেছে ১.১ শতাংশে। অর্থাৎ ১৯৮৩-'৯৩ দশকের সঙ্গে তুলনায় ১৯৯৪-২০০০ এই সময়ে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেড়েছে, অথচ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার হয়ে গেছে অর্ধেকেরও কম। তথ্য থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধির সম্পর্ক ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। ১৯৮৩-'৯৩ দশকে যেখানে ১ শতাংশ জাতীয় আয় বাড়লে চাকরির হার ০.৫ শতাংশ বাড়ত, ১৯৯৪-২০০০-এ তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.২ শতাংশে। অর্থাৎ, জিডিপি যদি ১০ শতাংশও বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থান বাড়বে মাত্র ২ শতাংশ। বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা হিসেব করে জানাচ্ছেন, জিডিপি বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৮ শতাংশ হলে, কাজ পাবে, খুব বেশি হলে, মাত্র ৫০-৬০ লক্ষ মানুষ — এদেশের ভয়াবহ বেকারত্বের তুলনায় যার পরিমাণ অতি সামান্য। (সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন, ১-২-০৭, সৌম্য চক্রবর্তীর প্রবন্ধ)

শুধু ভারতে নয়, গোটা বিশ্বেরই আজ এই অবস্থা। উন্নত দেশগুলিতে তো বটেই, এমনকী উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বিপুল বেকারত্ব। সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনীতি সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, বিগত তিন বছরের মতো ২০০৬ সালেও বিশ্বজুড়ে, এমনকী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথেষ্ট উঁচু। রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এই দিক দিয়ে সবচেয়ে সামনের সারিতে রয়েছে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। এখানে '০৬ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির গড় হার ছিল ৭.৬ শতাংশ। চীন গত বছর সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে ১০ শতাংশ বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রেও এই সময়ে উৎপাদনবৃদ্ধির হার যথেষ্ট বেশি — গড়ে ৬.৭ শতাংশ। (সূত্র ঃ দ্য স্টেটসম্যান ২০-১-০৭)

অথচ সেখানে কর্মসংস্থানের হাল কীরকম? রাষ্ট্রসংঘেরই আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের (আই এল ও) রিপোর্ট অনুযায়ী, তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ২০০৫-এর তুলনায় ২০০৬-এ গোটা বিশ্বজুড়ে কর্মহীনতার হার বেড়ে গেছে। সারা বিশ্বের কর্মহীন মানুষের সংখ্যা সর্বকালের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে ১৯ কোটি ৫২ লক্ষে পৌঁছেছে। এদের মধ্যে রয়েছে ৮ কোটি ৬৩ লক্ষ তরুণ-তরুণী, যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও একই অবস্থা। সেখানে ১৯৯৬-এ কর্মহীনতার হার ছিল গড়ে ৪.৪ শতাংশ, ২০০৬-এ তা বেড়ে গিয়ে ৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও বিত্তশালী কিছু মানুষের আয় বৃদ্ধি ঘটছে, সাথে সাথে বাড়ছে আর্থিক বৈষম্য। কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষের দারিদ্র্য বাড়ছে। গরিব আরও গরিব হচ্ছে। তাদের বাঁচাই কঠিন হয়ে পড়ছে। তাদের কেনবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। কারখানা মালিক উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারছে না। ফলে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কল-কারখানা, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পালা চলছে। এইভাবে চক্রাকারে কর্মহীনতার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে দারিদ্র্য, কমছে ক্রয়ক্ষমতা — যার পরিণতিতে বাজার সঙ্কটের ঘূর্ণিপাকে পড়ে শেষপর্যন্ত সঙ্কটে পড়ছে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

তাই এমনকী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদেরও কারো কারো টনক নড়েছে। আই এল ও তার রিপোর্টে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছে। ২০০৭ সালের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, 'সকলের জন্য শিক্ষা', 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য', 'কিংবা 'সকলের জন্য পানীয় জল'-এর মতো তাদের অসংখ্য নির্ধারিত লক্ষ্যের যা হাল হয়েছে, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। কারণ যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে আজ সারা বিশ্ব চলছে, সেই পুঁজিবাদ মুমূর্ষু — বাজারসঙ্কটে ভুগছে। এই সঙ্কট দূর করার ক্ষমতা পুঁজিবাদের আজ আর নেই। সর্বোচ্চ মুনাফা বজায় রেখে চলতে হলে আজকের দিনে পুঁজিমালিকের পক্ষে বিপুল হারে কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ মুনাফা অটুট রাখতে উচ্চপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তারা উৎপাদন করছে, ফলে কর্মসংস্থান কমছে। পুঁজিবাদের এটা পরিণাম। তাই এখানে-ওখানে সামান্য কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলেও বেকারত্বের সঙ্কট নির্মূল করা দূরস্থান, তা কমিয়ে আনাও এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আঘাতে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উৎখাত করতে পারলে তবেই একমাত্র এ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

নন্দীগ্রামে বিরাট সমাবেশ

একের পাতার পর

এদিনের সভায়। কে উপস্থিত ছিলেন না এদিনের সভায়! দরিদ্র কৃষক, খেতমজুর, বর্গাদার, গ্রামীণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ছাত্রছাত্রী — সকলেই। সকলকে ছাপিয়ে এদিনের সভায় দলে দলে এসেছিলেন নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ। সংখ্যায় প্রায় অর্ধেকই ছিলেন তাঁরা। এই সভায় তাঁদের সংগঠিত করে আনতে হয়নি, প্রচার শুনেই সংগ্রামের সাথী এস ইউ সি আই-এর বক্তব্য শুনতে ছুটে এসেছেন নিজেরাই — পরিবার-পরিজন নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী রাজনীতি তাঁদের মধ্যে যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তা-ই যেন নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার আন্দোলনে মূর্ত রূপ পেয়েছে। এই আন্দোলন তাঁদের বিপ্লবী রাজনীতির প্রতিও আগ্রহী করে তুলেছে। তারই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তাঁদের চোখে-মুখে। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন, একটি শব্দও যেন তাঁদের কান এড়িয়ে না যায়। গ্রামের সাধারণ মহিলা, বৃদ্ধ কৃষক সকলেই কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্যে মাঝে মাঝেই মাথা নেড়ে সহমত প্রকাশ করছিলেন। মুখের অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছিল, হ্যাঁ, এই তো তাঁদের মনের কথা। তাঁদের গভীর মনোযোগ, আগ্রহ দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেছেন সাধারণ মানুষ, বাজারের দোকানদাররা, পঞ্চায়েত, থানা, হাসপাতাল প্রভৃতি অফিসের কর্মীরা। বলেছেন, এত মানুষ, অথচ কী শৃঙ্খলা! তাঁরা বলেছেন, এস ইউ সি আই আন্দোলনের পার্টি বলে জানতাম, কিন্তু তারা যে ইতিমধ্যে এতখানি শক্তিশালী হয়েছে তা জানতাম না। সভা শুরুর আগে বিশাল এক সুশৃঙ্খল মিছিল নন্দীগ্রামের বাজার, পঞ্চায়েত অফিস, হাসপাতাল প্রভৃতি এলাকা পরিক্রমা করে সভাস্থলে উপস্থিত হয়। পথে আটের দশকের শুরুতে নন্দীগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের শহীদ সুদীপ্ত তেওয়ারির মূর্তিতে মাল্যদান করেন ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড ভবানীপ্রসাদ দাস। মঞ্চের সামনে মাঠে তিল ধারণের স্থান ছিল না। দূরবর্তী বাজার পর্যন্ত ভিড়ে ঠাসা। ঘরের ছাদেও দাঁড়িয়ে ছিলেন বহু মানুষ। সভার শুরুতে নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুরের বীর শহীদদের স্মরণে স্থাপিত শোকবেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর, কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য কমিটির সদস্য ও অ্যাবেকার সভাপতি কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস, রাজ্য কমিটির সদস্য, মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা সহ জেলার নেতৃবৃন্দ। সভাপতি হিসাবে কমরেড মানব বেরার নাম প্রস্তাব করেন কমরেড ভবানীপ্রসাদ দাস, সমর্থন করেন কমরেড আনসার হোসেন। প্রথমেই বক্তব্য রাখেন নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক ও এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ পাত্র। সভাপতির পর প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। তিনি নন্দীগ্রামের কৃষক প্রতিরোধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেখান, কীভাবে এই সংগ্রাম গোটা দেশজুড়ে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষকে পুঁজিবাদী শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। তিনি বলেন, ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি আপনাদের সংগ্রামের হাতিয়ার। একে রক্ষা করে যেতে হবে। তিনি নন্দীগ্রাম থেকেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানান। সভাশেষে, পার্টির রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গত কয়েক মাস ধরে সংগৃহীত অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় নন্দীগ্রামের শহীদদের পরিবারের হাতে। শহীদ ইমাদুল খানের পিতা আবদুল দাইহান খানের হাতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন, শহীদ সুপ্রিয়া জানার স্বামী সুকুমার জানার হাতে কমরেড প্রভাস ঘোষ, শহীদ গোবিন্দ দাসের পিতা ভানুচরণ দাসের হাতে কমরেড রণজিৎ ধর, শহীদ রতন দাসের স্ত্রী তাপসী দাসের হাতে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, শহীদ বাসন্তী করের পুত্র তাপস করের হাতে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, শহীদ রাখাল গিরির পিতা প্রতাপ গিরির হাতে কমরেড ছায়া মুখার্জী, শহীদ জয়দেব দাসের ভাই সুখদেব দাসের হাতে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। সভাস্থলে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে নির্যাতিতা ও আহতদের প্রায় ১২০০ পরিবারকে এই পর্যায়ে ত্রাণ দেওয়া হয়। ঘোষণা করা হয় কয়েক দিনের মধ্যেই দ্বিতীয় দফায় আরও বেশ কিছু পরিবারকে ত্রাণ সাহায্য করা হবে। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষ যেভাবে নন্দীগ্রামের আক্রান্ত মানুষের জন্য আবেগের সাথে এস ইউ সি আই-এর ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সেজন্য দলের পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানানো হয়।

সভাশেষে নন্দীগ্রামের মানুষ ফিরে যান আরও দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে, অন্যরা ফেরেন নন্দীগ্রামের সংগ্রামী তাপে উত্তপ্ত হয়ে। এলাকার সাধারণ মানুষ, কৃষক, দোকানদাররা ফিরে চলা মানুষদের হাত তুলে অভিনন্দিত করেন।

সংগৃহীত অর্থ দেওয়া হল নন্দীগ্রামে

নন্দীগ্রামে জমিরক্ষার আন্দোলনে নিহত ও আহতদের পরিজনদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এস ইউ সি আই রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানায়। এই উদ্দেশ্যে দলের পক্ষ থেকে একটি ত্রাণ তহবিলও গঠন করা হয়েছিল। হাটে বাজারে রাস্তায়, পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ মানুষ দলের কর্মীদের হাতে যেমন অর্থসাহায্য তুলে দিয়েছেন, আবার অনেকেই সরাসরি ত্রাণ তহবিলে অর্থ পাঠিয়েছেন। সংগৃহীত অর্থ গত ৩০মে-র জনসভায় নন্দীগ্রামের আর্ত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অর্থ ছাড়া অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী যা সংগ্রহ করা চলছে তা পরে বিতরণ করা হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ নীচে দেওয়া হল ঃ

- কলকাতা — ১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা
- দক্ষিণ ২৪ পরগণা — ১ লক্ষ ২ হাজার টাকা
- মেদিনীপুর — ৫৩ হাজার ৫৬৫ টাকা
- মুর্শিদাবাদ — ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা
- পুরুলিয়া — ৩০ হাজার ৭০০ টাকা
- হাওড়া — ২৯ হাজার টাকা
- বর্ধমান — ২৫ হাজার ৬০০ টাকা
- বাঁকুড়া — ২১ হাজার ৭৩৫ টাকা
- বীরভূম — ২১ হাজার টাকা
- উত্তর ২৪ পরগণা — ২০ হাজার ৫০০ টাকা
- কোচবিহার — ১৫ হাজার ১০০ টাকা
- নদীয়া — ১৩ হাজার ৮০০ টাকা
- হুগলি — ১৩ হাজার ৭০০ টাকা
- দার্জিলিং — ১২ হাজার ৭০০ টাকা
- জলপাইগুড়ি — ৯ হাজার ৮০০ টাকা
- মালদা — ৮ হাজার ৫০০ টাকা
- দক্ষিণ দিনাজপুর — ৪ হাজার ৫০০ টাকা
- উত্তর দিনাজপুর — ৩ হাজার ৫০০ টাকা

মোট ঃ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ২০০ টাকা

ব্রাসেলস্-এ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনার

অন্যান্য বছরের মত এবছরও ৪ থেকে ৬ মে, ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেলজিয়াম-এর উদ্যোগে ব্রাসেলস্ শহরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আলোচ্য বিষয় ছিল — ''নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা।'' বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৪৩টি পার্টি এই সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ভারত থেকে এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী এই সেমিনারে যোগ দেন।

এই উপলক্ষে কমরেড মানিক মুখার্জী ইউরোপের অন্যান্য দেশেও যান এবং সমমনোভাবাপন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতাদের সাথে আলোচনা করেন। ৯ ও ১০ মে বার্লিনে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ডয়েসল্যান্ড (বলশেভিক)-এর নেতা কমরেড হান্স্ বাওয়ারের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর মত বিনিময় হয়। ঐ বৈঠকে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি অফ ডয়েসল্যান্ড (বলশেভিক)-এর অন্যতম নেতা কমরেড আলরিখ বাওয়ার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলী পড়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। তাঁর লিখিত 'স্ট্যালিন দি গ্রেট মিলিটারি সায়েন্টিস্ট' রচনাটি নানা মহলে খুবই সমাদৃত হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রখ্যাত রচনা ''সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক স্ট্যালিনবিরোধী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে ক্রুশ্চেভকে খোলা চিঠি'' জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং সেটি কেপিডি (বলশেভিক)-এর পক্ষ থেকে পুস্তকরূপে প্রকাশও করা হয়েছে। এবার তিনি কমরেড ঘোষের রচনাবলীর প্রকাশিত তিনটি খণ্ডই অনুবাদ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কমরেড মানিক মুখার্জী কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন এবং রচনাবলীর একটি সিডি কমরেড বাওয়ারের হাতে তুলে দেন।

জার্মানির এই পার্টি বর্তমানে ঐ দেশের বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপকে একত্রিত করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের একটি মঞ্চ গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই সংগ্রামে তারা এস ইউ সি আইকে গুরুত্বপূর্ণ সাথী মনে করে।

এম এল সি পি (নর্থ কুর্দিস্তান) পার্টির নেতাদের সঙ্গে জার্মানিতেই কমরেড মানিক মুখার্জীর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। ২০০৫ সালের ২৪ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে তুরস্কের এম এল সি পি-র প্রতিনিধি কমরেড নুরান যোগ দিয়েছিলেন। কনভেনশনে তাঁরা প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, দেশে দেশে যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম গড়ে তুলতে হবে, তেমনই অঞ্চল ভিত্তিতে রিজিওনাল ফোরাম গঠনের জন্যও সচেষ্ট হওয়া দরকার। এই প্রস্তাবে কলকাতা কনভেনশন সম্মতি দিয়েছিল। সেইমতো তারা ইতিমধ্যে আরব দেশগুলিকে নিয়ে আঞ্চলিক সম্মেলন করেছে। এম এল সি পি (নর্থ কুর্দিস্তান) ও এস ইউ সি আই ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে ঐ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় পুনরায়

কমিউনিস্ট পার্টি অব ডয়েসল্যান্ড (বলশেভিক)-এর নেতা কমরেড হান্স বাওয়ারের সঙ্গে আলোচনা করছেন কমরেড মানিক মুখার্জী (সর্বদক্ষিণে) বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

অঙ্গীকার করা হয়।

নন্দীগ্রামে চাষীদের 'সেজ' বিরোধী রক্তক্ষয়ী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও সেখানে এস ইউ সি আই-এর ভূমিকার বিষয়ে কমরেড মুখার্জী বিস্তারিত আলোচনা করেন। এম এল সি পি'র নেতৃবৃন্দ জানান যে, নন্দীগ্রামের আন্দোলন নিয়ে তাঁদের পার্টির পত্রপত্রিকায় তাঁরা লিখবেন।

১২ মে প্যারিসে এম এল সি পি'র পক্ষ থেকে আয়োজিত একটি সেমিনারে কমরেড মুখার্জী অংশ নেন। বিষয় ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংগ্রাম।

১৪ ও ১৫ মে কমরেড মুখার্জী এথেন্সে যান এবং সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি অফগ্রীস (এম এল) -এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড গ্রেগরি কনস্ট্যান্টো পাউলস্ ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানোলি আরকস-এর সাথে তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের বহু প্রশ্নেই দু'টি পার্টির মতের অভিন্নতা প্রকাশ পায়। গ্রীসের পার্টি মনে করে, বিংশতি কংগ্রেসের আগে থেকেই সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিতে সংশোধনবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। গ্রীসের পার্টিকে 'মাওবাদী' বলে অভিহিত করাতে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই যুগটা লেনিনবাদের যুগ এবং আমরা লেনিনবাদী। মাও সে তুঙ লেনিনেরই ছাত্র ছিলেন।'

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে এস ইউ সি আই-এর মূল্যায়নের দিকগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড মুখার্জী দেখান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাম্যবাদী আন্দোলনের অগ্রগতি ও সফলতার গৌরবকে স্বীকার করেই কমরেড শিবদাস ঘোষ, 'কমিনফর্ম' থেকে টিটোর বহিষ্কারের প্রক্রিয়ার মধ্যে যান্ত্রিকতার দোষটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এছাড়া আরও নানা বিষয়ে কমিউনিস্টদের আত্মসমালোচনার রূপেই তিনি ত্রুটিবিচ্যুতির দিকগুলি তুলেছিলেন। সমালোচনার এই রীতিটি গ্রীসের পার্টিকে আকৃষ্ট করেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার সংগ্রাম

সেমিনারে কমরেড মানিক মুখার্জী

''নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাগুলির আলোকে পার্টি গঠন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা'' বিষয়ে ৪ মে ব্রাসেলস্ সেমিনারে কমরেড মানিক মুখার্জী নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন।

লেনিন বলেছিলেন, ''বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোনও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে না'' এবং একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ''শ্রমিকশ্রেণী যারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে তাদের অগ্রগামী বাহিনীই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।'' তিনি আরও বলেছেন, ''অগ্রগামী যোদ্ধার ভূমিকা শুধুমাত্র সেই পার্টিই পালন করতে পারে, যে পার্টি সবচেয়ে অগ্রসর তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত।'' এই লেনিনীয় শিক্ষাগুলি শতবর্ষ আগের মতোই আজও সমানভাবে কার্যকরী। আমরা জানি, রুশ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিটি না থাকলে নভেম্বর বিপ্লব সম্ভব হত না। একইভাবে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বকে যদি রাশিয়ার মাটিতে লেনিন বিশেষীকৃত না করতেন, সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব ও তার কর্মপদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ না করতেন, তাহলে রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক) -এর প্রতিষ্ঠাই সম্ভব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বইয়ের দশকে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের চিন্তা রাশিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, শত শত মার্কসবাদী 'গ্রুপ' তৈরি হয়েছিল। সকলেরই ভাবনা তখন সমাজতন্ত্র। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার উপায় নিয়ে তর্কবিতর্কে 'স্বতস্ফূর্ততার ধারণা', 'অর্থনৈতিক দাবির সংগ্রামই একমাত্র পথ', 'ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত হিংসার পথেই বিপ্লব' ইত্যাদি নানা ধরনের চিন্তাভাবনা দেখা যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন করে ১৯০১ সালে লেনিন বললেন, ''একথা স্বীকার করতেই হবে যে, লড়াইয়ের চরিত্র ও হাতিয়ার কী হবে, যেটা বাস্তব কাজের দিক থেকে একটি মৌলিক প্রশ্ন — তার এখনও মীমাংসা হয়নি এবং এখনও এ সম্পর্কে প্রায়ই গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। এ অবস্থা প্রমাণ করে যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোরতর অনিশ্চয়তা ও আদর্শগত দোদুল্যমানতা রয়েছে।'' এভাবেই লেনিন সরাসরি প্রশ্নটা রাখলেন এবং সাথে সাথে সর্বহারা বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নটির মীমাংসা করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন।

মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষাগুলির উপর নির্ভর করে এবং নতুন যুগে বিপ্লবী আন্দোলনগুলির অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা লেনিন গড়ে তোলেন। রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির অভ্যন্তরে বিশেষত মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্নে লেনিন বিরামহীন আদর্শগত সংগ্রাম চালান। এই লড়াইয়ে তিনি এমনকী পুরনো পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন পার্টি, প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি, আর এস ডি এল পি (বলশেভিকস্) গঠন করেন। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিন নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেন, ''ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সর্বহারার সংগঠন ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার নেই। বুর্জোয়া দুনিয়ার নৈরাজ্যমূলক প্রতিযোগিতার সামনে বিচ্ছিন্ন, পুঁজির বাধ্যতামূলক শ্রমের পীড়নে নিষ্পেষিত, নিঃস্বতা, বর্বরতা ও অবক্ষয়ের অতল গহ্বরে ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত যে সর্বহারাশ্রেণী, তারা অপরাজেয় শক্তিরূপে দাঁড়াতে পারে এবং অবশ্যই দাঁড়াবে একমাত্র যখন মার্কসীয় নীতিগুলির ওপর তাদের আদর্শগত ঐক্য সংহত হবে বাস্তবে একটি সংগঠনের মধ্য দিয়ে, যে সংগঠন লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে একটি সেনাবাহিনীর মতো একসূত্রে বেঁধে দেবে।'' লেনিন আরও বলেন, ''একজন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট (তখন কমিউনিস্টদের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটই বলা হত — স.গ) একথা মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেতে পারে না যে, সমাজতন্ত্রের জন্য সর্বহারাদের, এমনকী সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এজন্যই সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির অবশ্য দরকার পৃথক, স্বাধীন ও কঠোরভাবে নিজস্ব একটি শ্রেণীদল।'' অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় লেনিন বললেন, ''পার্টি হচ্ছে শ্রেণীর রাজনৈতিকভাবে সচেতন, অগ্রসর অংশ — শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী। এই অগ্রগামী বাহিনী শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যার চেয়েও শতগুণ, এমনকী শতগুণেরও বেশি শক্তিশালী। এটা কি কখনও সম্ভব? একশজনের কি হাজার জনের চেয়ে বেশি শক্তি হতে পারে? হ্যাঁ, হতে পারে এবং বাস্তবেও হয়, যখন সেই এক'শ জন সংগঠিত হয়।''

এরকমই ছিল লেনিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত নতুন ধরনের পার্টি। এটি ছিল এমন একটি পার্টি, যার লক্ষ্য ছিল সর্বহারাশ্রেণীর দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, সঠিক আদর্শ ও সঠিক কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে যে পার্টি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছে, যে পার্টি একটি বিপ্লবী তত্ত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল, যার আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র ও শৃঙ্খলা এবং জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ বাঁধনে যে পার্টি আবদ্ধ ছিল।

এই লেনিনীয় শিক্ষাগুলিই, ভারতবর্ষে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি রূপে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার প্রশ্নে মূল স্তম্ভ রূপে কাজ করেছে। পার্টি গঠনের এই লেনিনীয় মডেলের উপলব্ধিকে আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও উন্নত করেছেন। ভারতবর্ষের গৌরবময় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী ধারার পথ বেয়েই আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের অভিঘাত ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে গভীরভাবে পড়েছিল। বহু মানুষই এদেশে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হন। এঁদের আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগের মানসিকতা কম ছিল না। কিন্তু কেউই ভারতের বিশেষ পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সঠিক রাস্তা দেখাতে পারেননি। শেষপর্যন্ত সিপিআই সবচেয়ে বড় পার্টি হিসাবে দেখা দেয়। বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের স্বীকৃতিও তারা পায়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলা হচ্ছে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম

পাঁচের পাতার পর

কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় সিপিআই কখনই একটি বিপ্লবী দল ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক লাইন নিরূপণ ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে সিপিআই বহু ভুল করেছিল বলেই কমরেড ঘোষ ঐ সিদ্ধান্তে আসেননি। তিনি ঐ ভুলগুলির চরিত্র ব্যাখ্যা করে দেখান যে, মৌলিক চরিত্রের ভুলগুলির জন্যই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করে নেয় এবং ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। মৌলিক চরিত্রের এই ভুলগুলি ছিল সঠিক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। সিপিআই-এর চরিত্র ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করে কমরেড ঘোষ বলেন যে, লেনিনীয় দ্বন্দ্বমূলক বিচারধারা অনুসরণ করে এই পার্টি গড়ে ওঠেনি, এদের আচরণের মধ্যেও তা নেই, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ এই পার্টি কখনই অনুসরণ করেনি। ফলে সিপিআই একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির রূপেই গড়ে উঠেছে, যাকে কখনই সংস্কার করে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করা যাবে না।

এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি নতুন পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব তুলে নেন। তিনি বলেন, লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। লেনিন যখন বলেছেন, বিপ্লবী তত্ত্ব, তখন তিনি একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং পলিসি বোঝাতে চাননি। তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেট করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমণ্ডলকেই বুঝিয়েছেন। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এবং অতীতের ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতার থেকে শিক্ষা নিয়ে কমরেড ঘোষ এবং আরও কয়েকজন ১৯৪৬ সালের মে দিবসে একটি প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন গড়ে তোলেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে ভারতের মাটিতে বিশেষীকৃত করার প্রক্রিয়ায় পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার পূর্বসূরী ছিল এই প্ল্যাটফর্ম, যার মর্মবস্তুটা (content) ছিল একটি বিপ্লবী পার্টির মতই। এটা ছিল এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়।

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ার রূপেই এই প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন গড়ে তোলা হয়। লক্ষ্য ছিল, যাঁরা এলেন, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের স্বার্থকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে দ্বিধাহীনভাবে পুরোপুরি একাত্ম করবেন এবং পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের আদর্শের ভিত্তিতে বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠন সংক্রান্ত লেনিনীয় শিক্ষাকে আরও বিকশিত করে বললেন, ''একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার আগে তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হবে।''

''প্রথমত, যাঁরা দল গঠন করতে আগ্রহী হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে জড়িত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বাস্তব ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখিনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের এই বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয়, এবং যতদিন পর্যন্ত, যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন সেই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত ধারণার জন্ম না হয়, মনে রাখতে হবে, ততদিন পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেবার সময় আসেনি। দলের সকল সদস্যের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব — লেনিনের এই শিক্ষাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ''একটি কমিউনিস্ট পার্টিতে যৌথ নেতৃত্ব বলতে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার পদ্ধতি বোঝায় না। যৌথ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে মানে হচ্ছে, দলের সমস্ত নেতা ও কর্মী, র‍্যাঙ্ক এ্যান্ড ফাইল, শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, দলের সর্বোচ্চ কমিটির কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। দলের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে যখন এইভাবে সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ হয়, নেতৃত্বের বিকাশের একমাত্র সেই স্তরেই দলের অভ্যন্তরে গ্রুপইজম এবং নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে খতম করা সম্ভব এবং দলের অভ্যন্তরে এই অবস্থার উদ্ভব হলেই একমাত্র বলা চলে যে, দলটি প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করতে ও যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে।'' রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লেনিন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও সে তুঙের অভ্যুত্থান সেই সমস্ত পার্টিগুলিতে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।''

তৃতীয়ত, ''দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদল প্রফেশনাল রেভলিউশনারির জন্ম দিতে হবে।'' প্রফেশনাল রেভলিউশনারি বলতে তিনি পয়সার বিনিময়ে হোলটাইম কর্মী বোঝান নি। প্রফেশনাল রেভলিউশনারি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকী ব্যক্তিগত ব্যাপারেও, বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় সাবমিট করতে সক্ষম।

লেনিন বলেছেন, ''আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে, (১) লক্ষ্যে অবিচল নেতাদের একটি সুপ্রতিষ্ঠ সংগঠন ছাড়া কোন বিপ্লবী আন্দোলন টিকে থাকতে পারে না। ...এই সংগঠনের সদস্যরা হবেন তাঁরাই, যাঁরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রফেশনাল রেভলিউশনারির মতো লিপ্ত আছেন। (২) একটি স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রে, এই ধরনের একটি সংগঠনের সদস্যপদ প্রফেশনাল রেভলিউশনারির মধ্যেই যতটা সীমাবদ্ধ রাখতে পারব, যারা গোয়েন্দা পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার কাজে প্রশিক্ষিত, ততই সেই সংগঠনকে রাষ্ট্রের পক্ষে খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য হবে।'' লেনিনের এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, জারের রাশিয়ায় গোপন পার্টির কাজকর্ম প্রসঙ্গেই তিনি প্রফেশনাল রেভলিউশনারিদের কথা আলোচনা করেছেন। এরা হচ্ছেন সেই জাতের বিপ্লবী, যারা বিপ্লবের স্বার্থ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পার্টির প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। লেনিনের চিন্তাকে আরও ব্যাখ্যা করে কমরেড ঘোষ বলেছেন, আজ কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার সংগ্রামের সাথে প্রফেশনাল রেভলিউশনারি হওয়ার সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

জীবনের খুঁটিনাটি সকল দিক ব্যাপ্ত করে দলের নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার জন্য দলের অভ্যন্তরে তীব্র ও নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার উপর কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বদা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সংগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে, সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করা, অর্থাৎ ব্যক্তি সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা।'' ''প্রয়োজন হচ্ছে constant common association, constant common discussion and constant common activity (প্রতিনিয়ত একসঙ্গে মেলামেশা, একসঙ্গে আলোচনা, একসঙ্গে কাজ)-র মধ্যে নেতারা পার্টি কমরেডদের সাথে নিজেদের জীবনকে এমনভাবে যুক্ত করবেন, যাতে তার মধ্য দিয়ে কমরেডরা তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি সমস্যার উত্তর পায় এবং কমিউনিস্ট রুচি-সংস্কৃতি গড়ে তোলার সংগ্রামটা শক্তিশালী হয়।''

অপর যে বিষয়টির উপর কমরেড ঘোষ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হ'ল, একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে কখনও গ্রুপ থাকতে পারে না। ''একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি — দলের মধ্যে গ্রুপ বা উপদলীয় মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে পারে না। কারণ গ্রুপ মানেই হচ্ছে সমান্তরাল, আর সমান্তরাল মানেই হচ্ছে পার্টির অভ্যন্তরে আলাদা আলাদা সমান্তরাল চিন্তাধারা যা একটি বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে সম্ভব হতে পারে।'' চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াও লাইন হিসাবে গৃহীত হয় যে, পার্টির অভ্যন্তরে সর্বদা দুই লাইনের সংগ্রাম থাকবে। একদিকে বুর্জোয়া লাইন, অন্যদিকে সর্বহারা লাইন। এই বক্তব্যের মধ্যকার ভ্রান্ত যুক্তিধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কমরেড ঘোষ বলেন, ''এমন হলে একটি শ্রমিকশ্রেণীর দলকে কখনই সর্বহারার অগ্রগামী বাহিনী বলা যাবে না। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতেও মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু সে পার্থক্য হচ্ছে একই বিচারধারা বা চিন্তাধারা, অর্থাৎ একই চিন্তাপ্রক্রিয়ার কাঠামোটির মধ্যেই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব। একটি কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে এধরনের পার্থক্য বা দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব কোন অবস্থাতেই চিন্তাপদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার অস্তিত্বকে বোঝায় না।'' এই ধরনের পার্থক্য বা দ্বন্দ্বের সমাধান তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই করতে হবে। কিন্তু একে কখনই শ্রেণীশত্রুর মধ্যে দ্বন্দ্ব বলে দেখা চলে না। ''বরং দু'জনেই লড়াইটা এমন কায়দায় পরিচালনা করছে যে, এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দু'জনের সম্পর্ক শুধু বিঘ্নিত হচ্ছে না, তাই নয়, পার্টির মধ্যে দু'জনের বোঝাপড়া আরও পরিষ্কার হচ্ছে, ঘনিষ্ঠ হচ্ছে এবং এই লড়াইটির যথার্থ সমাধানের ভিত্তিতে ঐক্য আরও সুদৃঢ় হচ্ছে, পার্টিটা শক্তিশালী হচ্ছে। সুতরাং ঐক্যের কাঠামোর মধ্যেই আমরা বিশেষ বিষয়টা সমাধানের জন্য চূড়ান্ত লড়াই করছি — লড়াইয়ের চরিত্রটা হচ্ছে এই পর্যায়ের।'' ১৯৪৬ সালে গঠিত 'প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন' থেকে এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে এবং এই লাইনে আদর্শ ও সংগঠনগত সংগ্রাম পরিচালনার পর এবং প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ করার পরই একমাত্র ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা কনভেনশনের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আইয়ের উদ্ভব হয়।

লেনিনের সময়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদ আজকের মতো অবক্ষয়ের চরম পর্যায়ে যায়নি। বর্তমানে এর ভূমিকা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত এবং ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণা, যা সামন্তী শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করার সংগ্রামে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, এখন তা সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের পথে একটা বিরাট বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিবাদের মারাত্মক প্রভাব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই কেবল বিপজ্জনক নয়, এমনকী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও তা আজ ধসিয়ে দিচ্ছে। এই সময়ে আমাদের পার্টিকে গড়ে তুলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের বর্তমান অবস্থা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের কাছ থেকে নতুন ও উন্নততর চরিত্র, কমিউনিস্ট নীতিনৈতিকতা বিষয়ে গভীরতর উপলব্ধি দাবি করে। লেনিন বা মাও যা বলেছিলেন, আমরা যদি তার নিছক নকল করি, তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশগুলি তো বটেই, এমনকী ভারতেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমস্যা প্রকট রূপ নিয়েছে, যেখানে বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা একটা সুবিধায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছেন, ''প্রাক-বিপ্লব রাশিয়া বা প্রাক-বিপ্লব চীনে, যেখানে বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলো নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, সেসব দেশে কমিউনিস্ট চেতনা ও নীতিনৈতিকতার যে মান নিয়ে বিপ্লব সফল করা সম্ভব ছিল — আজ ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে ব্যক্তিবাদ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে এবং ব্যক্তিবাদের সমস্যা যেখানে একটা প্রচণ্ড জটিল সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে — সেখানে অতীতের সেরকম মান নিয়েই কি ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও তাকে দূর করা সম্ভব?'' তিনি বললেন, অতীতে কমিউনিস্ট চেতনার সর্বোচ্চ মান ছিল, ''সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃশর্তে সারেন্ডার করতে পারা, সবসময় পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থকে বড় বলে মনে করা এবং পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে সারেন্ডার করতে পারা।''...''কিন্তু আজকের নতুন পরিস্থিতিতে এটা আর সত্যিকারের উঁচুদরের কমিউনিস্টের মান বা স্তর থাকতে পারে না।'' আজ ''নিয়ত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেবার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।'' তিনি আরও বলেছেন, ''ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের কাছে বিসর্জন দেওয়া, আর ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে বিলীন করা — এই দুটো এক বা সমার্থক নয়। যখন ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দেবার কথা বলছি, তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ব্যক্তিস্বার্থের একটা আলাদা অস্তিত্ব থাকছে। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে বিলীন করতে পারলে ব্যক্তিস্বার্থের এই আলাদা অস্তিত্ব থাকে না।'' ''এই সংগ্রামটা হচ্ছে আসলে রুচি-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংগ্রাম।''

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর কমরেড ঘোষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, সমাজতন্ত্রেও রাষ্ট্র থাকছে, আর রাষ্ট্র আছে মানেই তা দমনের একটি হাতিয়ার রূপে আছে। তিনি বললেন, ''ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ব্যক্তিকে সামাজিক স্বার্থের কাছে 'সাবমিট' করতেই হবে এবং ততদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দমনমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানসের বিদ্রোহ করার ঝোঁক বারবার দেখা দিতে থাকবে এবং এর ফলে সামাজিক লক্ষ্যটা বারবার মার খেতে থাকবে। বারবার ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে এবং তার মধ্যে সামাজিক অনীহার মনোভাব বাড়তে থাকবে। ফলে কমিউনিস্ট আদর্শের যে

সাতের পাতায় দেখুন

যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ

দিল্লির কংগ্রেস সরকার বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে এডস্ নিবারণের নামে বিদ্যালয় স্তরে যৌনশিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর প্রতিবাদে ২৫ মে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর দিল্লি রাজ্য শাখা যৌথভাবে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

ব্রাসেলস্-এ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সেমিনার

ছয়ের পাতার পর

জোর, 'ডেডিকেশন'-এর যে জোর, তা কমে যাবে। আর নয়, আরেকটা হবে, 'লিবারালাইজেশন'। অর্থাৎ ক্রমাগত দাবি উঠবে যে, ব্যক্তির অধিকার আরও বাড়াতে হবে। আর এইভাবে চলতে থাকলে তা পুনরায় সংশোধনবাদের জন্ম দেবে এবং পুঁজিবাদকেই ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।'' কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন যে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ায় শোধনবাদ যে মাথাচাড়া দিল ও শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব কবজা করে ফেলল, তার জন্য কমিউনিস্ট চেতনার নিম্নমানই প্রধানত দায়ী। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে চাপা পড়া অবস্থাতেও পুঁজিবাদের বীজ ছিল, অর্থাৎ শোধনবাদের উত্থানের অনুকূল বস্তুগত ভিত্তি বা অর্থনৈতিক উপাদান সমাজে ছিল। এবং আদর্শগত ক্ষেত্রে ঘাটতির জন্য, পুঁজিবাদের ওই বীজ বেড়ে ওঠার ও আগাছার মতো ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। এই বিপদের দিকটি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের দৃষ্টি এড়ায়নি, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে তিনি ব্যক্তিবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জরুরি প্রয়োজনের কথাও বলেছিলেন। চীনেও মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির নেতা-কর্মী ও সমগ্র জনগণের আদর্শগত মান উন্নত করার জন্য সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের এই ধারা পরবর্তী সময়ে ক্রুশ্চেভ ও দেঙ চক্র পরিত্যাগ করে, যার ফলেই শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান ঘটে গেল।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৫৯ বছরে এস ইউ সি আই শ্রমিক, গরিব চাষী, খেতমজুর ও অন্যান্য সকল অংশের মেহনতি মানুষকে জড়িত করে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন এবং চাষী ছাত্র, যুবক ও মহিলাদের মধ্যে গণসংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। জনজীবনের নানা সমস্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার জন্য কমরেড ঘোষের শিক্ষানুযায়ী গণকমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে, যার মধ্য দিয়ে জনগণের বিকল্প শক্তির জন্ম দেওয়াই পার্টির লক্ষ্য। একই সাথে কর্মী ও নেতাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রুচিগত মান উন্নত করার জন্য পার্টির অভ্যন্তরেও অবিরাম আদর্শগত সংগ্রাম চালানো হচ্ছে। আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পার্টি সংগ্রামী জনগণের আস্থা অর্জন করেছে এবং একদিন মুষ্টিমেয় কমরেড নিয়ে শুরু করে পার্টি আজ একটি বিস্তৃত শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বের সমস্ত প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির মতোই এস ইউ সি আই-ও নিজেকে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপেই মনে করে এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার পতাকা সর্বদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকে। আন্তর্জাতিক প্রতিটি ইস্যু ও সমস্যায় আমাদের পার্টি সর্বদা সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আবার একই সাথে সাম্যবাদী আন্দোলনে কোনও ভুল-ত্রুটি এবং বিচ্যুতি ঘটছে মনে করলেই, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার একমাত্র উদ্দেশ্য থেকে, আত্মসমালোচনার মতো করেই তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। মার্শাল টিটোর বিচ্যুতির ঘটনা, বিংশতি কংগ্রেসে শোধনবাদের প্রকাশ, হাঙ্গেরিতে সংকট, ক্রুশ্চেভের স্ট্যালিনবিরোধী অভিযান, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট মিলিটারির হস্তক্ষেপ, মাও সে-তুঙের মৃত্যুর পর চীনের পার্টির শোধনবাদী লাইন প্রভৃতি প্রশ্নে পার্টি সেই ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে। আমাদের পার্টির অভিমত হল, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের সঠিক উপলব্ধি দরকার। আমরা মনে করি, শ্রেণীগত অবস্থান ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিচারে লেনিনের সময়ে যে পরিস্থিতি ছিল, আজও মূলগতভাবে সেটাই রয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে আজও আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগেই রয়েছি। অতি সম্প্রতি যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, তা হল, সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লবের পরিণামে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙন ঘটেছে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা লেনিনের মূল্যায়ন পাল্টে যায় না।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য বিশ্বের সকল দেশে কমিউনিস্টদের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ব্যাপকতম ঐক্যের ভিত্তিতে গণফ্রন্ট গড়ে তোলা দরকার। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই ফ্রন্টগুলোর মধ্যে দিয়ে কার্যকরী গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় নিরন্তর আদর্শগত সংগ্রাম ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে আমাদের অভিন্ন মতামতে পৌঁছবার এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার চেষ্টা চালাতে হবে। সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলোর বিশ্বব্যাপী সমন্বয় ঘটানোর জন্য আমরা আবেদন রাখছি। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যে বিপর্যয় ও হতাশা দেখা দিয়েছে, তাকে দূর করে বিপ্লবী প্রেরণায় তাকে আবার উজ্জীবিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত ভিত্তির উপর বিশ্বব্যাপী সমন্বিত এরকম আন্দোলনই একমাত্র পথ।

পুঁজি ছুটছে রিয়েল এস্টেটে, অর্থনীতি সংকটে

শিল্পায়নের ধুয়া তুলে শহর ও পাকা সড়কের আশেপাশে উর্বর কৃষিজমি দখলের জন্য সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের মরিয়া চেষ্টার বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই-ই একমাত্র বলেছে যে, বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান সংকটের যুগে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। আসলে পুঁজিপতিশ্রেণীর অন্যতম মতলব হ'ল, শিল্পের নামে জমি অধিগ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত বিপুল লাভজনক রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করা, যদিও এই বিপুল লাভজনক অবস্থাটার মেয়াদও অনিশ্চিত। আমরা এও দেখিয়েছি যে, কৃষি ও যন্ত্র শিল্প, অর্থাৎ অর্থনীতির মূল দু'টি ক্ষেত্রের ক্ষয়ের পাশাপাশি রিয়েল এস্টেটের মত ক্ষেত্র ফুলেফেঁপে ওঠা অর্থনীতির সংকটের লক্ষণ। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক বিধিনিষেধ আমাদের বক্তব্যের সত্যতাকেই প্রমাণিত করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করেছে যে, এখন থেকে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় খুশিমতো বিদেশি বাণিজ্যক ঋণ নেওয়া যাবে না। কারণ হিসাবে সরকার বলেছে, মুদ্রাস্ফীতি রোখার জন্য এই পদক্ষেপ জরুরি। এর আগে আভ্যন্তরীণ বাজারে অর্থের যোগান কমাতে সরকার যখন ব্যাঙ্কের সি আর আর দু'দফা বাড়ায়, তখন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় ব্যাঙ্ক ঋণের ক্ষেত্রেও শর্ত আরোপ করে। এ থেকেই বোঝা যায়, জাতীয় অর্থনীতিতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হওয়ায় বাজারে টাকার যোগান মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। বস্তুত, গত কয়েক বছর গড়ে যেখানে ১৫/১৬ শতাংশ হারে টাকার যোগান বাড়ছিল, সেখানে গত বছর টাকার যোগান বেড়েছে ২০ শতাংশের বেশি। সরকারের হিসাব ছিল, গত বছর সর্বাধিক ২২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ আসবে, সেখানে এসেছে ২৪০০ কোটিরও বেশি ডলার। এর ওপর দেশের ব্যাঙ্কগুলিও রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় মোটা ঋণ দিয়েছে। এই টাকা বাজারে এসে যাওয়ার ফলে ওপরতলার একদল মানুষের আয় বেড়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য এই চাহিদাবৃদ্ধি অর্থনীতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, রোগের লক্ষণ। কারণ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বাস্তবে কিছু উৎপাদন হয় না। প্রচুর জমির ক্রেতা এলে জমির দাম টাকার অঙ্কে বেড়ে যায়, ফলে, জমির ওপর কোন উৎপাদনমুখী কাজ করতে গেলে, মানে কলকারখানা বা কারখানার অফিস-কাছারি করতে গেলে তার মূলধনী খরচ বেড়ে গিয়ে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এমনিতেই বাজারে বিক্রি কম, তার ওপর দাম বেড়ে গেলে পুঁজিপতিদের লাভ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তার ওপর বাজারে ডলারের যত ক্রেতা, তার থেকে জোগান বেড়ে গেলে ডলারের দাম পড়ে যায়। ডলারের তুলনায় টাকার দাম বেড়ে যাওয়ায় বিদেশের বাজারে ভারতের রপ্তানি পণ্যের দাম বেড়ে যায়, তাতে রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের বাজারে টান ধরে। তারা সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে ডলার আমদানি কমাবার জন্য। অথচ একশ্রেণীর বৃহৎ পুঁজির ডলার দরকার। তাছাড়া একচেটিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থে এদেশের সরকার বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী পণ্য এবং পুঁজির বাজার বাধাহীন করার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ। সেটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই নানা পুঁজিপতি গোষ্ঠীর স্বার্থ মেটাতে কখনও বেশি আলগা, কখনও একটু কঠোর নীতি সরকার নিচ্ছে। যেমন এই রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় ২০০৫ সাল পর্যন্ত কেবল অনাবাসী ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাই বিদেশ থেকে বিনিয়োগ করতে পারত, ২০০৫-এর মার্চ মাসে এই বিধি তুলে দিয়ে সামান্য কিছু শর্তসাপেক্ষে ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সারা দুনিয়াতেই এবং ভারতবর্ষেও এখন পুঁজি উদ্বৃত্ত, কলকারখানা হচ্ছে না, সেই বাড়তি পুঁজি লাভজনক বিনিয়োগের জন্য দুনিয়ার সর্বত্র ছুটছে। টাটা, রিলায়েন্সের মতো একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নেমেছে। ভারতবর্ষে জমি বাড়ির ব্যবসা লাভজনক জানা মাত্র বিদেশি পুঁজি প্রধানত এদেশের পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে অথবা সাবসিডিয়ারি খুলে আসতে শুরু করেছে হু হু করে। স্ট্যানলি মর্গান, মেরিল লিঞ্চ, সালিম প্রভৃতি কোম্পানি এদেশে আসতে চাইছে। রিয়েল এস্টেট ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধির সাথে এদেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির সংকট মাত্রার বাইরে চলে যেতে শুরু করেছে। সংকটগ্রস্ত বাজারে অনুৎপাদক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়তে থাকলে বাজারে একটা ফাঁপা চাহিদা সৃষ্টি হয়, তাতে বুর্জোয়া মাপকাঠিতে ওপর ওপর অর্থনীতির একটা অগ্রগতি দেখা যায়। কিন্তু দু'দিন বাদেই সেই স্ফীত বেলুন ফেটে যায়। এজন্যই এই ধরনের বৃদ্ধিকে বলা হয় বুদবুদ অর্থনীতি, এর উপরটা অর্থাৎ চাহিদার দিকটা বেশ তেজি দেখায়, কিন্তু উৎপাদন বাড়ালেই সংকট দেখা দেয়। কারণ ভেতরটা অর্থাৎ দেশের বেশিরভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকটা ফাঁপা থাকে। এদেশে এখন এটাই সত্যি।

আমরা দেখিয়েছি, শিল্পায়ন বর্তমান পুঁজিবাদী সংকটের যুগে সম্ভব নয়। বড় জোর দু' একটা কারখানা হতে পারে মাত্র, তাকে শিল্পায়ন বলে না। আমাদের কথার সত্যতা যে কতখানি তা আবারও প্রমাণ হ'ল এইভাবে যে, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় লাভ দেখে কিছুটা পুঁজি বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তা সংকট ডেকে এনেছে এবং সরকারকে তার ওপর রাশ টানার কথা বলতে হচ্ছে। বাস্তবে কতটা রাশ টানা হবে তা এখনও বলা যায় না, কারণ রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী লবিরও চাপ আছে। তবে ইতিমধ্যেই ইকনমিক টাইমস (২১.০৫.০৭) লিখেছে, যেভাবে বিধিনিষেধ আনা হচ্ছে তাতে বড় ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হবে না। ছোট ছোট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, যাদের ক্রেডিট রেটিং কম, অর্থাৎ বিপুল লাভ তারা তুলে দিতে পারবে কি না তা সমীক্ষা করে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের কাছে যে সব ছোট সংস্থা কম নম্বর পায়, তাদের অসুবিধা হবে।

এই পদক্ষেপের ফলে মুদ্রাস্ফীতির হার কাগজে কলমেও কমবে কি না তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। তবে তা কমলেও জনগণের আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই, কারণ তাতে চাল-ডাল-তেল নুনের দাম কমবে না। জমি, বিলাসবহুল ফ্লাট, ইস্পাত, সিমেন্টের দাম যদি কম হারে বা সরকারের প্রত্যাশিত হারে বাড়ে তাতে ৮০ কোটি ভারতবাসীর বা ১৪/১৫ কোটি বস্তিবাসী ভারতীয়ের কতটুকু যায় আসে!

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

নন্দীগ্রাম ঃ চিকিৎসাবৃত্তির নৈতিকতা ভূলুণ্ঠিত

গত ২৮ মে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে চিকিৎসাবৃত্তির নৈতিকতার অবমাননা এবং নন্দীগ্রামের গণহত্যায় আহতদের প্রতি চিকিৎসায় চূড়ান্ত অবহেলার প্রতিবাদে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে এক অভিনব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। প্রায় তিনশত ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী ও বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গুরে জমি কেড়ে নেওয়ার কারণে মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার শিকার প্রশান্ত দাস সহ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন এম এস সি-র কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র। কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক নিগ্রহ, কর্মবিরতি এবং হাসপাতালের অব্যবস্থা, অরাজকতা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন মেডিকেল ছাত্র নেতা ডাঃ মৃদুল সরকার। সভায় এক সুরে ধ্বনিত হয়, নন্দীগ্রামের ভূমিরক্ষা আন্দোলনে আহত মানুষদের নিয়ে চিকিৎসারীতি বহির্ভূত যে সমস্ত কাজকর্ম করা হয়েছে তা যেমন নিন্দনীয়, তেমনই নন্দীগ্রাম থেকে তমলুক হয়ে পিজি হাসপাতাল পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়ে যে অবহেলা, গাফিলতি, উদাসীনতা দেখানো হয়েছে তা রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের প্রধান শাসকদলের পরিকল্পনারই অঙ্গ। বিশেষত মহিলাদের গণধর্ষণ ও যৌননির্যাতনের চিহ্ন যাতে লোপ পেয়ে যেতে পারে এবং ধর্ষণ যাতে কোনমতেই প্রমাণিত হতে না পারে তার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যপ্রশাসন যে সতর্কতায় ধর্ষিতা মহিলাদের সময়মতো মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করেনি তা চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুতর অপরাধ এবং রাষ্ট্রীয় বর্বরতা ও দলীয় নারকীয়তাকে ধামাচাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ।

কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শল্যচিকিৎসক, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহসভাপতি ডাঃ অসীমকুমার রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, চিকিৎসক সমাজের মাঝেও কুলাঙ্গার আছে এবং তারাই সরকারকে তার অপকর্ম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তারা মেডিকেল এথিক্সকে পদদলিত করছে — যা রক্ষা করা প্রতিটি ডাক্তারের কর্তব্য।

বিশিষ্ট কবি, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল বলেন, ডাক্তাররা তাদের মহান এথিক্স ও সামাজিক দায় ভুলে যাচ্ছে। নন্দীগ্রামের পরবর্তী ঘটনায় সরকারি ডাক্তারদের ক্রিয়াকলাপে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসকদের সামাজিক সম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী পার্থসারথী সেনগুপ্ত বলেন, চিকিৎসকরা তাঁদের

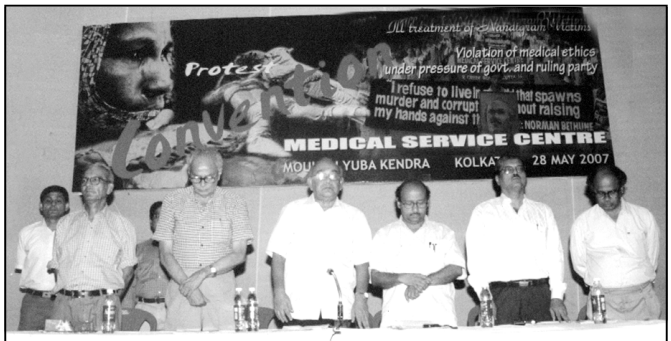

২৮ মে কনভেনশনে নন্দীগ্রামের শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালন

নৈতিকতা বন্ধক রেখেছেন চাকরির কাছে। বদলি, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, পদোন্নতির চিন্তা সমাজের আর পাঁচটা পেশার মতো সরকারি ডাক্তারদেরও বেঁধে ফেলেছে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত বলেন, যে নেতারা এবং মন্ত্রীরা বলছেন, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন হয়নি — তাঁরা জেনেশুনেই সত্য আড়াল করতে চাইছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে গণধর্ষিতা কাজল মাঝি, রাধারানি আড়ি, সবিতা দাশদের রেকর্ড করা কথা এবং আর্তি সভার মধ্যে শুনিয়ে ক্ষোভের সাথে বলেন, নন্দীগ্রামের নিরীহ কৃষক রমণীরা মিথ্যা কথা বলছে — আর যত সত্য বলছে যারা ঘাতক, আর যারা ধর্ষকদের পাঠিয়েছে? তিনি আরও বলেন, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কাছে সমস্ত নথি এবং চিকিৎসার রেকর্ড আছে, যা আমরা হাইকোর্টেও জমা দিয়েছি — সেসব তথ্যই ধর্ষণ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে কিনা, ধর্ষণের চিহ্ন সরকারিভাবে পাওয়া গেছে কি না — এসব প্রশ্ন অবান্তর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি আরও বলেন, এ'সব করার কথা তো ছিল সরকারি চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনেরই। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক অভিযুক্তদের প্রথমেই কেন গ্রেপ্তার করা হল না, তার জবাব কি মুখ্যমন্ত্রী এবং দলীয় নেতারা দেবেন? জার্নাল অব আই এম এ-র প্রাক্তন সম্পাদক এবং মেডিকেল কাউন্সিল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সদস্য ডাঃ সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, সরকারি চাপের কাছে নতিস্বীকার করে চিকিৎসাবৃত্তিতে নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া চিকিৎসকদের কাছে অবমাননাকর। মেডিকেল এথিক্সকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার তার জন্মলগ্ন থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। চিকিৎসক সমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতার সেই কঠিন পথই অনুসরণ করা কর্তব্য।

সভায় বিশিষ্ট আইনজীবী জয়মাল্য বাগচী বলেন, "নিহত, আহত এবং ধর্ষিতাদের প্রাথমিক পরীক্ষা যাঁরা করেছিলেন এবং যে সমস্ত প্রমাণ নথিবদ্ধ করেছিলেন — কোন কিছু প্রমাণের জন্য তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ভিত্তিতেই দোষীদের শাস্তি নির্দ্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সেগুলিতেই যথেষ্ট ঘাটতি হয়েছে বলে মনে হয়।"

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া বলেন, আজ এই দুর্দিনে একমাত্র মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার মহান ডাক্তার নর্মান বেথুন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ডাঃ কোটনিস, ডাঃ হ্যানিম্যানের দেখানো পথে মেডিকেল এথিক্সের সম্মান রক্ষার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সরকারি ডাক্তারদের বড় সংগঠন এ এইচ এস ডি, রাজ্য আই এম এ আজ সম্পূর্ণ নীরব। তমলুক হাসপাতালে ডাঃ প্রদীপ দাসের মতো মানবদরদী ডাক্তাররাও ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার। রোগীদের স্বার্থে এম এস সি'র ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য আন্দোলন করে যাবে। ইতিমধ্যে গড়চক্রবেড়িয়ায় এই উদ্দেশ্যে স্থায়ী চিকিৎসা ক্যাম্প শুরু করা হয়েছে।

এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের শল্য চিকিৎসক বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ জে সি পাল, অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা আশিস কুসুম ঘোষ, ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র প্রমুখ।

কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ডাক্তারদের কাজের পরিবেশকে স্বাধীন এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে রাজ্যব্যাপী চিকিৎসকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ত্রিদেশীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে ভুটানের শরণার্থী সমস্যার সমাধান করতে হবে

— নীহার মুখার্জী

ভুটান থেকে বিতাড়িত এবং নেপালে নানা ক্যাম্পে শরণার্থী হিসাবে অবস্থানরত জনগণ, যাঁরা নিজেদের ভুটানের নাগরিক বলে মনে করেন, তাঁদের ওপর ২৯ মে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ভারতীয় পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে দু'জনকে হত্যা করেছে এবং বহু মানুষকে আহত করেছে। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এক বিবৃতিতে বলেন — কয়েক দশক আগে ভুটান সরকার এঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত করে ভুটান থেকে বিতাড়িত করার পর নেপালের নানা শিবিরে এঁরা শরণার্থী হিসাবে বসবাস করছিলেন এবং উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে ভুটানে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। নেপাল ও ভুটানকে জড়িত করে উত্তর সীমান্তের এই ধরনের বিস্ফোরক পরিস্থিতির পটভূমিতে কমরেড মুখার্জী বলেন — আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে; তাই বর্তমানে সবচেয়ে জরুরি হল — ভুটান, নেপাল ও ভারতকে নিয়ে ত্রিদেশীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে, হাজার হাজার মানুষের জীবনের সাথে জড়িত গুরুতর সমস্যাগুলির ন্যায়সঙ্গত, স্থায়ী ও পারস্পরিক বোঝাপড়াভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করা। অথচ ভারত সরকার এই সমস্যাকে মানবিক দিক থেকে না দেখে নিছক আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখছে এবং এইসব বাস্তুহারাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে ও হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না।

কমরেড মুখার্জী বলেন, ভারত সরকারের উচিত চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় দেওয়া, ভুটান ও নেপালকে নিয়ে ত্রিদেশীয় আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং জটিল সমস্যার ন্যায়সঙ্গত ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে অর্থমন্ত্রকের অপসারণের দাবি

বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ২৩ মে কলকাতার নিজাম প্যালেস প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তরের অধীন শ্রম কল্যাণ সংগঠনের আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনে কলকাতা ও সন্নিহিত জেলাগুলি থেকে আগত প্রায় দেড় হাজার বিড়ি শ্রমিকের ১১ দফা দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে আওয়াজ ওঠে ঃ 'বিড়ি শ্রমিকদের কল্যাণ দপ্তরের কাজকর্ম ও তহবিলের উপর অর্থমন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চলবে না', 'বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ তহবিলকে ভারত সরকারের কনসোলিডেটেড্ ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা চলবে না', 'কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পগুলো বেসরকারি সংস্থা বা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব বাতিল করতে হবে এবং কল্যাণ দপ্তরকে আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করতে হবে', 'সমস্ত প্রকৃত বিড়ি শ্রমিকদের অবিলম্বে পরিচয়পত্র দিতে হবে এবং সমস্ত ভুয়া পরিচয়পত্র বাতিল করতে হবে' ইত্যাদি। বিক্ষোভ সমাবেশে আগত মহিলা বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সমাবেশের পক্ষ থেকে ৭ জনের প্রতিনিধি দল শ্রমকল্যাণ সংগঠন-এর ওয়েলফেয়ার কমিশনারের সাথে দেখা করে ১১ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করেন। এই দাবিগুলোর সমর্থনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সম্পাদক, বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা কমরেড অচিন্ত্য সিনহা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ৫ মে থেকে ১১ মে মালিকদের ডাকা ধর্মঘটের নামে লকআউট প্রসঙ্গে বলেন, এই বেআইনি লকআউটের ফলে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ৭ দিন কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন, তাঁদের উপযুক্ত মজুরি মালিককে দিতে হবে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

এস ইউ সি আই-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র

গণদাবী

পড়ুন ও গ্রাহক হোন

গ্রাহক চাঁদা ঃ
বার্ষিক — ৭৮ টাকা
(সডাক) — ৯১ টাকা
ষান্মাসিক — ৩৯ টাকা
(সডাক) — ৪৬ টাকা

গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
এস ইউ সি আই অফিস
৪৮ লেনিন সরণী,
কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৪-২২৩৪
২২৪৪-১৮২৮

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in